Machhranga

Gargi
Bhattacharya

******

COPYRIGHTED MATERIAL

মাছরাঙা

* *

গার্গী ভট্টাচার্য

প্রজ্ঞা পারমিতা ফুটফুটি আর

শুদ্ধশীল ঋ- কে

---দ্বীপান্তরের কাকিমা

The more refined one is, the more unhappy…..
Anton Chekhov

মাছরাঙা

গল্পটা কোন দেশের সেটা না বলে কার গল্প সেটা বলাই বেশি ভালো । দেশটি ভারতের কাছেই , মিথ-ভূমি । আর এই উপাখ্যান এক দরিদ্র গ্রাম্য মেয়ের । নাম তার বিজলী । বিজলী সাহা ।

গ্রামীণ মেঠোপথে সাইকেল চালিয়ে সে বেড়ে উঠেছে । বাবা দরিদ্র কারবারি । মোড়ের মাথায় চায়ের দোকান চালায় আর একটা ছোট টায়ারের দোকানে কিছু ব্যবসা করে । ওদের পূর্বপুরুষেরা অধিকাংশই ; সরকারের আজব নীতির জন্য, যুবক বয়সে বিদেশে --ক্রীতদাস হিসেবে যেতে বাধ্য হয়েছে । সেখানে লগ অর্থাৎ কাঠ চেরাই এর কাজে নিয়োজিত হয়েছে । কোনোদিনই তারা ফেরেনি । পালাবার চেষ্টা যারা করেছে তাদের মেরে ফেলা হয়েছে এবং দেশে তাদের পরিবারের

ওপরে অকথ্য অত্যাচার শুরু হয়েছে । এই দেশে একটাই সরকার । পাঁচবছর অন্তর ভোট হয় । কিন্তু লোকের কাছে একটিই চয়েস থাকে । কারণ একটিমাত্র লোক কিংবা তার পুত্র ভোটে দাঁড়ায় । ২০১৬ সালেও এই ব্যাভিচার চলেছে । লোকের চুলের ছাঁট , পোশাক এমনকি বিয়ের ব্যাপারেও সরকার হস্তক্ষেপ করে ।

মানুষ মুষড়ে থাকে । কিন্তু কোথায় যাবে দেশ ছেড়ে ?

দরিদ্র এই ব্যবসাদারের একটিমাত্র মেয়ে বিজলী আর চার-পুত্র । মেয়েই বড় । ছেলেরা লেখাপড়া করে । স্কুল-কলেজে । ব্যবসা বাড়ানোর ইচ্ছেতে দুই ছেলে বি-কম পড়ে । অন্য দুটি স্কুলে পড়ে । মাথা ভালো । তবে কবে সরকার বাহাদুর ওদের চলান করে দেবে কাঠের কাজে সেটা কেউ জানেনা । ভাগ্য ভালো থাকলে অন্য কেউ যাবে । ওদের পরিবার থেকে এই যাত্রায় বা জেনেরেশানে কাউকে নেওয়া হবেনা ।

শুধু মেয়েটি চায়ের দোকানে কাজ করে । রুটি সবজি বানায় । চা ও জলখাবার হিসেবে । আসলে এই এলাকায় প্রথম সন্তান মেয়ে হলে তাকে কুকুরের সাথে বিয়ে দেওয়া হয় ।

যাতে বংশে আর কখনও প্রথমে মেয়ে না হয় ।

মেয়েরা দূর্বল, অসহায় আর নির্বোধ । কাজেই কেউই চায়না যে তার ঘরে মেয়ে জন্মাক । দুনিয়ার সমস্ত মেয়ের জন্ম বন্ধ হয়ে গেলে বংশ বাড়বে কী প্রকারে সেই নিয়ে অবশ্যি কেউ মাথা ঘামায় না ।

ঘরে প্রথমে মেয়ে এলে, সেই মেয়েকে কুকুরের সাথে বিয়ে দিলে আর কারো প্রথম সন্তান মেয়ে হয়না ।

ব্যাপারটা অন্ধ বিশ্বাস বলা যায়না কারণ মেয়ে জন্মানো একেবারে প্রথমে ; বন্ধ হয়েই যায় ।

সরকারও এই প্রথায় সায় দিয়েছে কারণ যত যুবক সমাজে, তত ক্রীতদাস পাঠানো যাবে আর অর্থও আসবে অনেক--বিদেশ থেকে। বিদেশী মুদ্রা, মোহর ।

এরকমই এক ঘরে তো জন্মেছে বিজলী ! কাজেই প্রথম কন্যাসন্তান হিসেবে তাকে সারমেয় প্রিয়া করা হয়েছে । লোকে বলে- আজকাল কুকুরই পতিরূপে বেশি আদৃত । কারণ কুকুর মালিককে মানে বৌকে চিট্ করে না । অন্যের সাথে স্ত্রীর অজান্তে প্রেম বা সহবাস করেনা, ঠকায় না , পরকিয়া করে করে । কাজেই কুকুর স্বামী একটি লোভনীয় চয়েস্ । মন্দের ভালো ।

বিজলী অবশ্য সেরকম মনে করেনা । কিন্তু তার কোনো উপায় নেই । এই অঞ্চলের অনেক মানুষ অর্থাৎ মমতাময় পেরেন্টরা- মেয়ের বিয়েটা আগে অবশ্যই রাধামাধবের সাথে গোপনে সেরে ফেলে ।

কারণ ওদের বিশ্বাস যে এরকম অপয়া মেয়েকে সারাটা জীবন শ্রীকৃষ্ণই রক্ষা করতে পারবেন সমাজ ও দুর্ভাগ্যের হাত থেকে । কাজেই ঝুলন পূর্ণিমার দিন গোপনে ওরা মেয়ের বিয়ে দেন কৃষ্ণের সাথে । একেবারে কনেটি সাজিয়ে । তারপর দিনক্ষণ ও পাঁজি দেখে কুকুরের গলায় বরমাল্য দেয় মেয়েটি ।

এখানেই শেষ নয় । সারমেয়টি, নববধূকে চুম্বন এর বদলে শুঁকে দেখে ; তার গাত্রে কিঞ্চিৎ মুত্রত্যাগ করে ফেলে । অর্থাৎ নিজ এলাকা চিনে নেয় । তখনই বিয়ে সম্পূর্ণ হয় । যদি কুকুর, স্ত্রীর গায়ে মুত্রত্যাগ করে এরিয়া মার্ক না করে তার অর্থ হল এই যে সে ঐ মেয়েকে পত্নীরূপে বরণ করেনি । তখন ভিন্ন কুকুরের সন্ধান করে মানুষ । পর পর তিনটি কুকুর যদি স্ত্রীর মর্যাদা না দেয় তখন মেয়েটিকে গ্রামছাড়া করা হয় ।

তার ঠাঁই হয় কোনো বেশ্যাগৃহে অথবা কোনো কামুকের লুকানো গুহায়।

মদনমোহনের সঙ্গে বিয়ে দেবার ওটাও আর একটি কারণ। যদি আগে কৃষ্ণের বৌ হয়ে যায় তাহলে নাকি কুকুর মুত্রত্যাগ করেই ফেলে; কাজেই পিতৃগৃহেই কুকুর সমেৎ মেয়েটি জীবন কাটায়।

বিজলীকে ওর ভাইরা মজা করে বলতো : দিদি তুই এবার থেকে ভৌ-রব প্র্যাকটিশ্ কর। ভৌ-উ-উ-উ !

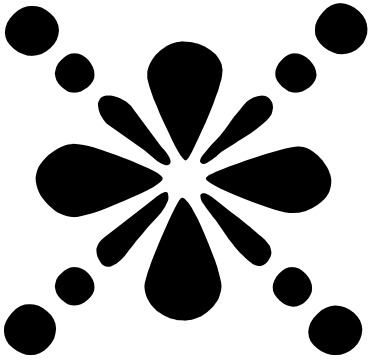

বিজলী অবশ্যি লেখাপড়া করতে খুবই ভালোবাসে । ওকে ওর দরিদ্র বাবা কিছু পড়িয়েছে ।

লাইব্রেরী থেকে পুরনো বই ধার করে আনে । খুব পড়ে । সমস্ত বই পড়ে ফেলে । সবরকমের বই পড়ে ।

লাইব্রেরিয়ান খুব দয়ালু । বলেন : বই মানুষকে জ্ঞান প্রদান করে । বই হল ঈশ্বর । কাজেই কেউ পড়তে চাইলে তাকে আমি না বলতে পারবো না ।

কাজেই মেম্বারশিপের ফিজ্ না দিলেও বই নিয়মিত পেতো বিজলী । খুব পড়তো ।

টায়ারের শুল্ক দোকানের এককোণায়, একটি লন্ঠন নিয়ে বসে- শীতের রাতে উষ্ণ চায়ের পেয়ালা হাতে পড়তো । বাবারা অনেক রাতে দোকান বন্ধ করতো । পাশেই হাইওয়ে । কাজেই অনেক মানুষ আসতো রাতে । বিশেষ করে অনেক দূরপাল্লার বাস ও ট্রাক্ ।

অনেক সময় ট্রাকে করে অস্ত্র-শস্ত্র চালান হতেও দেখেছে ওরা । ত্রিপলের নিচে সাজানো মরণাস্ত্র !

কত যাত্রীবাহী বাসের মানুষের সাথে পরিচয় হয়েছে । অনেক বন্ধুও হয়েছে । তাদের কাছ থেকে কতনা অজানা জিনিস জানতে পারে ।কত দেশের খবর পায় !

এইভাবেই ধীরে ধীরে আলাপ হয় এক লরি ড্রাইভারের সাথে । তার নাম কুমুদ । কুমুদ কুম্বলে ।

সে দক্ষিণী । ঘোর কৃষ্ণবর্ণ । কুতকুতে চোখ । আর বেশ গাট্টাগোট্টা । তামিল , কন্নড় , তেলুগু সব জানে । একবার বলছিলো : **সেঢ়ি, পোঢ়া, ইচ্ছানু , ছিঃঅসত্বে । পোঙ্গাড়া । আন্না। চিন্না ।**

বিন্দু বিসর্গ মানে না বুঝলেও বিজলী এরপর থেকে ওকে দেখলেই এগুলি আওড়াতোঃ **সেঢ়ি পোঢ়া ইচ্ছানু, ছিঃ অসত্বে। পোঙ্গাড়া । আন্না চিন্না !**

দুজনেই হেসে উঠতো । লোকটি এখান থেকে প্রায় অর্ধমাতাল হয়ে ফিরতো । বিজলী ভাবতো ::: অ্যাক্সিডেন্ট না হয় !

ওর ভাইরা বলতো :: তোর অত কি ? বুড়ো ব্যাটা নিজের ভালো না বুঝলে কে কী করবে ? আর আমরা বিজনেস করছি । যে শালা পয়সা দেবে, তাকেই মাল বেচবো !

লোকটির জন্য বিজলীর একটা কোমল দিক ছিলো । কেন সে জানে না ।

কুমুদ, মাসে দুবার কি তিনবার আসতো । ওর বাড়ি মাদুরাইয়ের দিকে এক গ্রামে । বাবা চাষী ।

কুমুদ বলতো যে কিছু টাকা জমিয়ে ও কাজটা ছেড়ে দেবে । গ্রামে একটা হোটেল খুলবে ।

এইভাবেই গল্প করতে করতে একদিন বিজলী ওর সাথে পালিয়ে যায় । তবে স্বামীকে ছাড়েনি ।

কুকুরটিকে সঙ্গে করেই নিয়ে যায় । কুমুদও আপত্তি করেনি ।

শহরে গিয়ে বিজলী কাজ নেয় । সেই লাইব্রেরিতে । বই-টই সাজানো । এগিয়ে দেওয়া এইসব । মাইনে যা পেতো ওর চলে যেতো । ওর স্বামীকে অর্থাৎ ঐ সারমেয়টিকে ভাড়া দিয়েছিলো । এক নিঃসঙ্গ দম্পতি ওকে নিয়ে যায় । মাসে মাসে টাকা দিতো তার জন্য । ও গিয়ে স্বামীকে দেখে আসতো মাসে একবার ।

ওর বরের নাম নবাব । নবাব এখন ঐ দম্পতির সাথে থাকে । অর্থাৎ ও কিছু রোজগার করে । আর কুমুদ লরি চালানো ছেড়ে একটি ছোট হোটেল খুলেছে গ্রাম আর শহরের মাঝে । হাইওয়ের ধারে । ওরা থাকে গ্রামেই । কুমুদের বাসায় । ওর বাবা ও মায়ের সাথে । কিন্তু কাজ করতে বিজলী যায় শহরে । সাইকেল চেপে । কুকুরটিও শহরেই আছে । নবাবী চালে হাঁটে আজকাল , নবাবজাদা !

কুমুদের সাথে কিন্তু বিজলীর বিয়ে হয়নি ।

মাঝবয়সী এই মানুষটিকে ও **বন্ধু ও দাদা বলে** ।

কুমুদও ওকে স্নেহ করে । আর বোনটি এত বই পড়তে পায় এখানে সেটা দেখে যারপরনাই আহ্লাদিত । এরকম বইপাগল মেয়ে সে দেখেনি । **বইয়ের পোকা**

যাকে বলে ! তাই বুঝি হেসে বলে : তুই উঁইপোকা না, তুই হলি বইপোকা।

আসলে কুমুদ সামান্য লেখাপড়া জানে । আর এই সহোদরা একেবারে **এ বি সি ডি** নয় এই মোট্টা মোট্টা বই পড়তে সক্ষম।

কুকুরের সাথে সহবাস হয়নি বলেই বোধহয় বিজলী সাহা এখনও কুমারী আছে; যাকে বলা হয় :: টেকনিক্যালি ভার্জিন !

কুমুদের মনে হয় যে বিজলীর আরো পড়া উচিৎ । যে এত বই ভালোবাসে তার আরো শিক্ষা বাড়ানো উচিৎ । কয়েকবার বলেছে । মেয়েটি বলে :: দাঁড়াও ! আগে কিছু টাকাপয়সা করি তারপর ।

এইভাবেই প্রাইভেটে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে । তারপর হোটেল ম্যানেজমেন্ট কোর্স ।

এতদিনে কুমুদের হোটেলে খুব রমরমা । দারুণ চলছে ব্যবসা । ইডলি , দোসা, উত্তাপাম, কার্ড রাইস , পোঙ্গল আর ভড়া-সম্বর দূর্দান্ত চলছে।

হাইওয়ের ধারে আরো দোকান আছে । কিন্তু ওর দোকানে এত লাইন হয় যে সেই লাইন রাস্তায় উঠে যায়

। আজকাল ও ভোরে দোকান খোলে আর মধ্যরাতে বন্ধ করে ।

সময়মতন প্রাইভেটে হায়ার সেকেন্ডারি ও পরে হোটেল ম্যানেজমেন্ট পাশ করে বিজলী । কিছু টাকা লোন নেয় । কিছুটা দেয় পাতানো দাদা , কুমুদ কুম্বলে । এইভাবে শিক্ষা সমাপ্ত করে সে কাজ নেয় একটি মাঝারি হোটেলে । বছর কয়েক ভালো কাজ করে । অভিজ্ঞতা হয় । তারপর সে চলে যায় অন্য শহরে ; একটি নামজাদা পুরানো হোটেলে ।

আগে এটি ছিলো এক কেল্লা । সেখানে মহা যোদ্ধারা বাস করতো । এখন এটি এক হোটেল । খুবই সুন্দর । বর্ণনাতীত । কিন্তু এখানে একটি সমস্যা আছে ।

এখানে আত্মা আছে । অর্থাৎ এই হোটেল চালাতে হলে, সেই আত্মার পারমিশন নিয়ে সমস্ত কাজ করতে হয় । ঢুকতেই একটি বড় পোর্ট্রেট । সেই যোদ্ধার ।

রাজতিলক, পাগড়ি আর ডাকুদের মতন গোঁফ ।

তিনিই মালিক । আজও । অলিখিত । হয়ত বা অবাঞ্ছিতও । কে জানে !

কেউ যদি প্রথম কাজে লাগে, তাকে গিয়ে ঐ পোর্ট্রেটের সামনে সেলাম ঠুকতে হয় । তারপর সেদিন রাতে নিজ ক্যামেরায় ছবি তুলতে হয় । যদি ছবি ওঠে তার অর্থ হল এই যে সেই কর্মীকে উনি গ্রহণ করেছেন একজন হোটেল কর্মচারি হিসেবে । যদি ফটো না ওঠে, তা সে যত ক্ষমতাশালী ফটোগ্রাফারই হোন্ না কেন তখন বুঝতে হবে যে উনি সেই কর্মীকে খারিজ করছেন । কাজেই এই **মহাবীর যোদ্ধা- চন্দন সিং রাঠোরের** অনুমতি বিনা, এই হোটেল চত্বরে কাজ করা অসম্ভব । এমনকি সমস্ত ডিসিশানও উনি কাল্টিভেট করেন । তারপর ছবি উঠলে বোঝা যায় যে সম্মতি আছে । ছবি ওঠা হল কম্পিউটারের এন্টার বা রিটার্ন সুইচের মতন । অর্থাৎ প্রোগ্রাম এবার চলবে ।

তাই লোকেরা ওকেই মালিক ধরে আর অন্যরা তার কর্মী । সবাই ওর জন্যই কাজ করে । কেউ প্রশ্ন করেনা , জবাবও চায়না । ওরা রহস্যেই বাঁচে ।

Secrecy is the element of all goodness; even virtue, even beauty is mysterious.--Thomas Carlyle *(1795-1881) British historian and essayist.*

এই আজব ভৌতিক হোটেলে কাজ নেয় বিজলী কিছুটা কৌতুহল বশেই । আর এরা ওকে কুকুর নিয়ে থাকতে অনুমতি দেয় । রাঠোর বলেছে, তাই । কুকুরের সাথে যখন ওর বিয়ে হয় তখন কুত্তা ছিলো চারমাসের শিশু । সহজেই মুত্রত্যাগ করতো আর সারা ঘরে ছুট্টে বেড়াতো । মুত্রত্যাগ খুব ইম্পর্টেন্ট । নাহলে বধূরূপে অস্বীকৃত । আর বৈধব্যর জ্বালা থেকে বাঁচাতে লোকে শিশু সারমেয়ই খুঁজতো ।কুকুর মারা গেলেই বৈধব্য ।

এখন নবাবের বেশ বয়স হয়ে গেছে তাই বিজলীর সাথেই আছে । যেকটা দিন আর বাঁচে বৌয়ের সেবাযত্নেই বাঁচুক ! সেই দম্পতি ওকে ছেড়েছে ।

এই আর কি । আর বিজলী এখন রোজগেরে গিন্নী । কাজেই কুকুর অবসর নিলেও অসুবিধে নেই । এই অদ্ভুত ভূতুড়ে আবাসে ওরা আছে ।

লোকজন খুব ভালো এখানে । যেহেতু মালিক অশরীরি তাই পাওনাগন্ডা বুঝে নিতে কর্মীদের কোনো অসুবিধে হয়না । নেই হিংসার পরশ । কারণ চন্দন সিং রাঠোরের নজর এড়ানো দায় । কোনো নোংরা রাজনীতির খেলা এখানে নয় । প্রেতের হাতে যাবে প্রাণ । অকালে ।

ওকে কেউ তো আর লিগালি কিছু করতে সক্ষম নয় কাজেই ।

এখানে এসে বিজলী ভালই আছে । শুধু কুমুদ দাদা আর ওর নতুন পরিবারের বাবা ও মা খুব দু:খ করে । বলে ::: শেষমেশ ভূতের খপ্পড়ে পড়লো মেয়েটা এত্তো পড়ালেখা করে ?

মজার ব্যাপার হল যে আজ পর্যন্ত বিজলীর দুটো বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও ও কুমারী । একজন স্বামী তো পরম ব্রহ্ম আর অন্যজন পশু । একজনের কৃপালাভে ও ধন্য আর অন্যজনের বিশ্বাস পেয়ে পেয়ে ও নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করে । কিন্তু সত্যি সত্যি বিয়ে মানে যা তা তো আর হয়নি তাই ও এখনও টেকনিক্যালি ভার্জিন ।

দু:খ যে হয়না তা নয় -কিন্তু কী আর করা ?

ও তো অনেক বই টই পড়ে কাজেই জানে যে একটা জিনিস আছে মেডিসিনে ; যাকে বলা হয় ইংলিশে ::

spontaneous orgasm----!!

এই ব্যাপারটা হল এই যে মেয়েদের নিজে থেকে অর্গাজম হয় । কোনো ফিজিক্যাল মিলন ছাড়াই । অনেকেই করে এটা । অনেকে সাদা আলোর বিচ্ছুরণ দেখে এই সময় । সেই সময় এত্তো আনন্দ হয় !!

যদিও অনেক সমাজে এগুলি ট্যাবু কিন্তু মেয়েদের মধ্যে যারা সাহসী তারা এগুলি করে থাকে । এতে রোগভোগের সমস্যা নেই আর দেহক্ষুধাও থাকেনা শুধু শুধু । স্বামীরও দরকার নেই । নেই প্রেগনেন্ট হবার ভয় । বেশ জিনিস এটা ।

নিজে থেকে সে অল্প অল্প করে এটা প্র্যাকটিশ্ করতো । শয্যায় শুয়ে । কুকুরটা ওর ঘরেই থাকতো । সে আবার এই সময় খাটের পাশে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে চেয়ে থাকতো । যেন বৌ পরকিয়া করছে !

এইরকমই একদিন ও হঠাৎ দেখে যে চন্দন সিং রাঠোর যেন ওর সামনে দাঁড়িয়ে ।

সেই মুখ, সেই চোখ, পাগড়ি , গোঁফ সমস্ত নিয়েই ।

জলজ্যান্ত মানুষটা, ওর অন্ধকার ঘরেই একফালি চাঁদের আলোর মতন দন্ডায়মান ।

ঘোর কাটতে একটু সময় লাগে বিজলীর ।

তারপর দেখে চন্দন সিং হা হা হা করে হাসছেন ।

বলে ওঠেন ::: কি মেয়ে, এখানে একা একা শুয়ে এসব কী হচ্ছে ?

একটু ঘাবড়ে যায় বিজলী । কারণ মালিক চটে গেলে চাকরি চলে যেতে পারে । ওর জন্য এই চাকরিটা - সোনায় মোড়া । থাকা-খাওয়া ফ্রি । কোনো পলিটিক্স নেই আর মাইনে খুব ভালো ।

ওকে অবাক হতে দেখে চন্দন সিং যেন বলে ওঠেন:: : আমি রাগ করিনি । তোমার সাহস দেখে বাহবা দিতে এলাম । আমাদের দেশে মেয়েরা লেখাপড়া শিখেও যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করতে পারেনা । কোনো না কোনো পুরুষের বাহুবল ওদের সম্বল । কিন্তু তুমি একটি অবলা জীবের স্ত্রী হয়েও নিজেই নিজের জৈবিক চাহিদা মেটাচ্ছো , কাজ করে ভালো মাইনে পাচ্ছো আর এত চ্যারিটি করছো দেখে তোমাকে কনগ্র্যাচুলেট না করে পারলাম না । তুমি সব্যসাচী । আমি তোমাকে মন দিয়েছি , আমাকে তোমার স্বামীত্বে বরণ করবে ?

একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় বিজলী । তিননম্বর স্বামী শেষমেশ এক প্রেতাত্মা ? জৈবিকদিক্ নিজেই সামলে নিতে পারে কিন্তু প্রেত স্বামী যদি ক্ষতি করে ?

মনে নানান দ্বন্দ । নানা ভয় । বিপদ ও শ্বাপদ সঙ্কুল এই জগতে ও একা । কাজেই একটু ভেবেচিন্তে কাজ করবে । সময় চেয়ে নেয় চন্দন সিং এর কাছে ।

তারপর সংবাদ দেয় কুমুদকে ।

কুমুদ শুনে হেসেই খুন -- বলিস্ কি ? শেষপর্যন্ত ভূত বর ? ভূতিয়া মরদ ?

সবাই জানে যে রাঠোর আজও ঐ হোটেলের মালিক । হোটেলে মানে সুবিশাল এক দূর্গ । কাজেই তার স্ত্রীর মর্যাদা পেলে বিজলীর ভাগ্য খুলে যাবে । পয়সাকড়ি ও পাওয়ারের আর সমস্যা থাকবে না কিন্তু এরকম এক পতি, বাস্তবে কতটা গ্রহণযোগ্য সেটা নিয়ে ওর যথেষ্ট সংশয় আছে । কাজেই অনেক ভাবনাচিন্তা করে ওরা দুজন । আর রাঠোর যখন নিজে ওকে বেছেছেন তখন ও আর পালাবে কোথায় ? ভূতের হাত থেকে পালানো এত সহজ ?

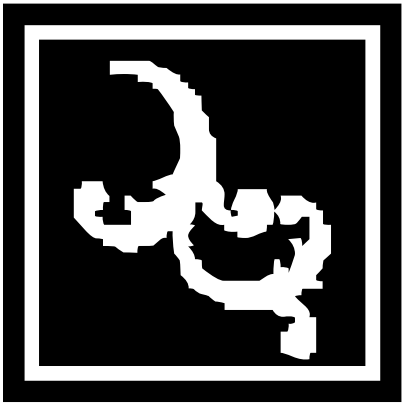

সতীপুরের পবিত্র নদী কাবেরী । সেই কাবেরীর তীরে হিন্দুদের পোড়ানো হয় । আজকাল কাঠের আকাল । গাছ কাটা , বৃক্ষ-ছেদন বারণ । কাজেই স্বল্প কাঠে চিতা জ্বালাতে হয় । বেশির ভাগ সময়ই আধপোড়া মৃতদেহ ছড়িয়ে থাকে নদীপাড়ে । সেই দেহাংশ আর পোড়া কাঠের অংশ ও ভস্ম কুড়িয়ে তোলে কিছু মানুষ । তারপর সেগুলি তারা নদীতে ফেলে দেয় । পবিত্র নদীর জলে ভেসে যায় মৃতের দেহাংশ যাকে দর্শনের ভাষায় বলা যায় সলিড থট্ ।

অনেক কিশোরকেও দেখা যায় এই কাজে নিয়োজিত । কিছু সংস্থা এইকাজের ভার নেয় । তারপর শিশু শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করায় ।

লাইব্রেরিতে, একটি সেকেন্ড হ্যান্ড বই পড়েছিলো বিজলী । এক গবেষকের লেখা । শিশুশ্রম ও শিশুদের জন্য আইন নিয়ে । সেখানে এই তথ্য পেয়েছিলো ।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে যায় মাথায় । চন্দন সিং কে যদি সে বিয়ে করে আর সতীপুরে গিয়ে ওরা হোটেল খোলে তাহলে কোনক্রমে এই প্রথা বন্ধ করা যেতে পারে ।

কুমুদ বলে ওঠে :: আমি বাপু অত টাকা খসাতে পারবো না । ওখানে খাবারের দোকান আমার চলবে কিনা জানিনা । এখানে রমরমা ব্যবসা । আমি সেই দোকান তুলে দিয়ে ওখানে যেতে পারবো না । তোমার ইচ্ছে হয় তুমি বাপু যাও ।

বিজলী নিজে তো দরিদ্র ঘরের মেয়ে তাই ওদের জন্য মনে মনে কাঁদে । এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চায়না । বলে :: না না, আমি রাঠোরকে বিয়ে করে ওখানে হোটেল খোলার কথা বলছিলাম ।

আবার বলে :: চন্দন সিং আমাকে ছাড়বে না । কাজেই যদি আমি এর থেকে কিছু ভালো জিনিস বার করতে পারি তো মন্দ কি ?

কুমুদ জোরে জোরে মাথা নাড়ে । হু হু হু হু ----!

ঠিক হয় যে ও বিয়েতে সায় দেবে । আর বিয়ে হবে খুবই লো- প্রোফাইল । মিডিয়া যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায় -- **প্রেতের সাথে মানবীর বিয়ে**, এরকম উদ্ভট কান্ড তো আধুনিক মানুষেরা তেমন দেখেনা কাজেই শোরগোল হবেই আর বিজলী ঠিক সেটাই চায়না ।

চন্দন সিং অসম্ভব বীর হলেও কোনোদিন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি । হয়ত যুদ্ধ করে সময় পেতেন না , কে জানে ? কাজেই এই যার ফার্স্ট ফ্লেম ও ম্যারেজ তাও **সুক্ষ্ম কায়া নিয়ে** তার বিয়ে, প্রবল মিডিয়া কভারেজ পাবে সেই বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই আর আজকাল যা চ্যানেলের ঘটা ও সংখ্যা ! এরকম নিউজ দেখাতে পারলে প্রচুর হিট্স্ হবেই । নাম ও ফেম বাড়বে চ্যানেলের । সেজন্য বিজলী স্থির করে যে বিয়েটা চুপিচুপি করবে ।

শুনলে অবাক হতে হয় যে **কুকুর নবাব** একদিন হঠাৎ মারা যায় । বয়স হয়েছিলো ভালই । কাজেই । বিজলী বিধবা হয়েই আবার সধবার বেশ পরে ।

বিয়েটা হয়েই যায় সময়মত ।

বিয়ের পরেই ,সমস্ত শ্বশুরকূলের যেমন নতুন রূপ দেখা যায় সেরকম সেও জানতে পারে -- যেই চন্দন সিং রাঠোরের এত সুনাম তিনিই নাকি শেষদিকে পকেটমারি করতেন । পয়সার অভাবে নয় কারণ তখন এখানে সদ্য এই হোটেল শুরু হয়েছে । তবে কেন ? মজা দেখার জন্য । ওনার মতে, উনি তো রাজা হয়েই জন্মেছেন কিন্তু যারা পকেটমার , চোর তাদের জীবনটা ঠিক কেমন হয় ?

সেটা কিছুটা অনুভব করার জন্যই পকেটমারিতে ঢোকা আর ছদ্মবেশে লোকের পকেট কাটা ।

কয়েকবার জেলের ঘানিও টেনেছেন । এইভাবে অনেকটা সময় কাটান । তারপর এই পেশা থেকে দূরে চলে আসেন । পুরোপুরি হোটেলে ডুবে যান ।

কিন্তু জেলে সময় কাটানোর জন্যই হয়ত ওকে টিবি রোগ , আক্রমণ করে । এবং মারা যান ।

বিবাহ করার ফুরসৎ হয়নি । নিজেকে **মাছরাঙা** বলতেন । বলতেন --আমি মাছারাঙার মতন জলের দিকে চেয়ে আছি ।উপযুক্ত মৎস্য পেলেই মারিব আর খাইবো সুখে , আনন্দে ।

বেঁচে থাকতে সেরকম মাছের সন্ধান নির্ঘাত পাননি ।

এখন মৃত্যুর পরে হয়ত বিজলীকেই সেই মৎস্য-কন্যা ঠাওড়েছেন ।

আস্তে আস্তে জানা গেলো যে চন্দন সিংয়ের আগেও এক মৎস্য প্রিয়া ছিলো । তার নাম ছিলো সুহানা । প্রত্যন্ত এক অঞ্চলের এই মেয়ে যেই উপজাতির মেয়ে তাদের মধ্যে মাত্র ৫০০জন তখন জীবিত ছিলো কারণ তারা বাইরের লোকের সাথে বিয়ে শাদী করতো না আর জেনেটিক কারণে তাদের সন্তান কম হত । এদের নাম **রেহপোপির** ।

এই কমিউনিটির মেয়েরা পর্দার আড়ালেই থাকতো কিন্তু সম্প্রতি তারা বাইরে আসা শুরু করে ।

যদিও এরা আশেপাশের এলাকার সঙ্গে বার্টার সিস্টেমে ব্যবসা করতো কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু কিছু নিজস্ব পেশাও ছিলো । যেমন মুখোশ বানানো ও মেহেন্দি শিল্প । মেয়েরা মেহেন্দি পড়াতো আর পুরুষেরা মুখোশ তৈরি করতো । ধর্মীয় মুখোশ আর নাচের মুখোশ আলাদা হত । ভালো কারিগরেরা ধর্মের গুলি বানাতো । এইরকমই এক মেয়ে **মেহেন্দি শিল্পী সুহানা** । সে এত সুন্দর কারুকার্য করতো যে লোকে ওকে খুবই বাহবা দিতো আর ও বেশ লোকপ্রিয় ছিলো । হয়ত সেইকারণে চন্দন সিংয়ের বোনের বিয়েতে তাকে

আনা হয় ঐ প্রত্যন্ত এলাকা থেকে ঘোড়ার পিঠে করে । পথে ঘোড়সওয়ারের মৃত্যু হলে চন্দন সিং তাকে নিজের অশ্বে করে নিয়ে আসেন । খুবই মধুময় ও রোমান্টিক সেই যাত্রা , সুহানার সুহানা সফর ।

মেহেন্দি শিল্পের সাথে সাথে সুহানা মুখোশের কারুকার্যও শিখেছে । ও মুখোশও বানাতে পারে । অনেক লোকই ওর মুখোশ কেনা শুরু করেছে নাচের জন্য । আর ও হল ওদের উপজাতির মধ্যে প্রথম মেয়ে যে মুখোশ বানাতে পারে । ওদের প্রিস্ট , যার কথায় ওরা ওঠে-বসে সে ওকে বারণ করেছিলো এগুলো করতে কিন্তু ও স্বাধীনচেতা । কারো কথা শোনার বান্দা নয় । বিশেষ করে অযৌক্তিক জিনিস ।

ওদের একজনই দেবতা, তা হল সূর্য আর একজনই দেবী তাহল বৃষ্টির দেবী । রেন গডেস । আর ঐ প্রিস্ট সমস্ত স্থির করে কীভাবে সমাজ চলবে ।

সুহানার প্রেমে পাগল চন্দন সিং । তার জন্য যা ইচ্ছে করতে পারেন । সুহানাও মন দিয়েছিলো কিন্তু ভিন্ন জাতির মানুষ ও শহুরে লোক হওয়ার কারণে ওর রেহপোপির জাতি ওকে এই বিবাহে সম্মতি দিতে বারণ করে । সুহানা নিজের জন্য ভাবেনি । ও সাহসী । কিন্তু ওর পরিবার ও ছোটবোন মহুরের জন্য সে চিন্তিত । ও চন্দন সিং রাঠোরের স্ত্রী হলে ওদিকে মহুরের

বিয়ে হবেনা । ওদের রেহপোপির কমিউনিটির যারা উপযুক্ত পাত্র তাদের কেউই ওকে বিয়ে করবে না। ওরা একঘরে হয়ে যাবে । হয়ত সেইকারণে সুহানা ওর প্রেমিককে ত্যাগ করে চলে যায় ।

সুহানার উপজাতি রেহপোপিরের মানুষ ঘোড়ার মাংস খায় । মিষ্টি ও স্বাস্থ্যকর এই মাংস আবার চন্দন সিংয়ের পরিবারের জন্য বিষ । ঘোড়া হল রাজা ও যোদ্ধাদের পরম বন্ধু । তাকে মেরে খেয়ে ফেলা অত্যন্ত পাশবিক কাজ বলে মনে করা হয় । কিন্তু রেহপোপিরের মানুষ ওদের আদিকাল থেকে খেতে অভ্যস্থ । তাই সেই ব্যাপারেও বিরোধ ছিলো দুজনের পরিবারের মধ্যে । কিন্তু মিঁয়া ও বিবি রাজি হলেও শেষকালে নিজেদের কূলবংশ প্রথাকে মর্যাদা দিতে ওরা নিজেদের প্রেমকে বলিদান দেয় । চন্দন সিং আর নারীতে লিপ্ত হননি । সুহানার খবর উনি লুকিয়ে রাখতেন । প্ল্যাটোনিক লাভ । সরাসরি যোগাযোগ রাখেননি কারণ তাহলে সুহানার ম্যারেজটা স্পয়েল হবে । সে তার স্বামীর প্রতি লয়াল থাকতে পারবে না । বিয়ে হয়েছিলো তারও এক বুড়োর সাথে । সেই বুড়োর আগে চার চারটে বৌ ছিলো, সবাই মৃতা । গন্ডাখানেক

সন্তান তার । সুহানার **বিলাইতি প্রেমিক** ছিলো বলে কোনো যোগ্য পুরুষ ওকে বিয়ে করেনি । তাই এই বুড়োর গলায় বরমাল্য দিতে একপ্রকার বাধ্য হয় । মজার ব্যাপার হল বুড়োর যত বৌ আছে সবাই একে অপরের থেকে অনেক ছোট । মানে বয়সের সাথে সাথে সে কচি মেয়েদের দিকে হাত বাড়িয়েছে ।

বলতো :: রাতে ঢ্যাড়স্ সিদ্ধর সাথে গরম দুধ আর মিস্রি খেয়ে শুলেই ডান্ডা খাড়া থাকবে ।

চন্দন সিং রাঠোর শুনেছেন যে সুহানাকে ওরা বাইরে থাকতে দিয়েছিলো । অন্দরে ওকে যেতে দিতোনা ওর বরের সন্তানেরা । ও মেহেন্দি আর মুখোশের কাজ নিয়ে ব্যস্ত রাখতো নিজেকে । ওকে দেখে অন্য মেয়েরাও মুখোশ শিল্পে হাত লাগায় আর ভালো করে । অনেক ক্ষেত্রেই ওরা পুরুষদের থেকে ভালো কাজ করে । নতুন ডিজাইন আনে এই ক্ষেত্রে । সুহানার তৈরি এক ডিজাইনার মুখোশের নাম ছিলো **খাম্বাজ** ।

সেই মুখোশ রাজা মহারাজারাও কিনে নিয়ে যেতো ।

কাস্টম বিল্ট মুখোশও ঐ প্রথম ওখানে চালু করে । তাতে ওদের ব্যবসা আরো বাড়ে । বিদেশীরা ওখান থেকে মুখোশ কেনা শুরু করে । সরকারের মাধ্যমে ।

পুঁথির মুখোশ ও ঘুঙুরের মুখোশও সুহানা ওদের মধ্যে চালু করেছিলো । কিন্তু এত গুণী মেয়েটির নিজস্ব জীবনে ছিলোনা কোনো শান্তি । যে মহারাণী হবার আহ্বানকে ঠেলে ফেলে, আত্মত্যাগ করে পরিবারের কারণে তাকেই দূরে ঠেলে দিয়েছিলো তার পরিবার, কমিউনিটি আর শ্বশুরকূল । প্রগাঢ় প্রেমের অপরাধে ।

চন্দন সিংয়ের কিছু করণীয় ছিলো না । কারণ ওদের এলাকায় তার প্রবেশ নিষেধ । নিষাদের তীরের শিকার হতে পারেন বলেই চুপ করে ছিলেন । নিজের স্বাধীনচেতা প্রেমিকাকে শেষ সময়ে শুধু দহনের ছায়ায় আর মৃত আবেগেই দেখেছেন । দহন , জ্বালা , হেমলক পান ।

মৃত্যুর পর সুহানাকে দাহ করার কেউ ছিলো না । শেষে ওর কাজের জগতের কিছু মানুষ একটি ঘোড়ার পিঠে মৃতদেহ শুইয়ে ওকে বনে ফেলে আসে । হয়ত চিল শকুনের খাদ্য হয় সে ।

চন্দন সিং মর্মাহত হলেও কিছুই করার নেই তার । অদ্ভূত নিয়ম মানব জগতের । কিছু কিছু নিয়ম সত্যিই প্রয়োজন আর কিছু কিছু নিয়মের শিথিলতাই কাম্য ।

নিয়ম চুরমার ।

Portrait of Bernardo de Galvez

A number of spirits reportedly haunt **The Hotel Galvez** in Galveston, TX. However, the stories surrounding the portrait of Bernardo de Galvez are some of the most chilling.
Born in 1746, Bernardo de Galvez was a Spanish military leader who aided the American colonies during the Revolutionary War. Bernando, who died in 1786, is also Galveston's namesake.

A portrait of Bernando de Galvez hangs at the end of a downstairs hallway at Hotel Galvez. Legend has it the portrait's painted eyes follow guests as they walk by. People who approach the painting often feel chilled or uneasy. The portrait's haunted reputation naturally appeals to tourists who try to photograph the painting. However, it seems guests can't get a clear photo unless they ask Bernando for permission. A paranormal

investigation team snapped a picture of the infamous portrait, but the photo was marred by **a skeletal image**. Perhaps they forgot to ask the long-dead Bernando for his consent to be photographed !!

Information from :::

http://ghostsnghouls.com/tag/bernando-de-galvez-portrait-haunted/

সুহানার মৃত্যুর পরে মুষড়ে পড়েন চন্দন সিং । তারপর থেকেই ওর যুদ্ধে যাওয়া একপ্রকার বন্ধ ।

পকেটমারিও কিছুটা সুহানার জন্যই শুরু ।

রাজার খেতাব তো বদলাতে পারবেন না কিন্তু নিজেকে চোর জোচ্চোর তো করতে পারবেন যাতে লোকে তাকেও নিচু চোখে দেখে , রেহপোপির উপজাতির মতন ; যারা **অশ্বমেধ যজ্ঞ নয় অশ্ব-বধের** মতন ঘৃণ্য কাজ করে ও একধরণের ক্ষমার অযোগ্য অপরাধী ।

যখন ছদ্মবেশে পকেট কাটতেন তখন দু-তিনবার সুহানার ডেরাতেও গেছেন । কিন্তু বিবাহিতা দয়িতাকে শুধু চোখের দেখা দেখেই চলে এসেছেন । তাকে ছোঁয়ার কিংবা তার সাথে আলাপ করার বাসনা ত্যাগ করেই ।

রাজারা কী না পারেন ? ইচ্ছে করলে সুহানাকে তুলে আনতে পারতেন যেমন আগে বহু রাজা নানান রাজ্যের রূপসীদের নিয়ে আসতেন । বাহুবলে ও বুদ্ধিবলে ।

কিন্তু উনি সেই পথে যাননি । সুহানার পরিবারের জন্য ত্যাগকে মর্যাদা দিয়েছিলেন । আজ হঠাৎ এত যুগ পরে

উনি আবার বিয়ে করতে চান তাও এক সাধারণ মেয়েকে ।

বিজলীকে এই কাহিনী ও চন্দন সিংয়ের এই অপূর্ব ইচ্ছে মোহিত করে ।

বিয়ে হয়েই যায় আর চন্দন সিং রাঠোর জানতে পারেন সতীপুরের চিতাভস্মের সাথে জড়িত এক করুণ কাহিনী । কিছু শিশু , যাদের খেলেধূলে সময় কাটাবার বয়স তারাই নদী কিনারায় দিনকাটায়, অপরিচিত মানুষের চিতাভস্ম ও পোড়া দেহাংশ কুড়িয়ে ।

তাদের শৈশব নেই , কৈশোর নেই , যৌবন নেই । আছে কেবল মৃত্যুর হাহাকার আর উদাস মেঘ । কালো মেঘে ঢেকে গেছে তাদের চেতনা । কামিনী ফুল আর কাঠগোলাপের সুগন্ধে মাতেনা ওদের প্রতিটি লগ্ন । ওরা ভ্রষ্ট । নষ্ট সমাজের হাতে ।

মেঘ ওদের জীবনে থ্রিলারের উৎস । আর ঘাতক মেঘ ওদের পোশাক । আর মেঘই ওদের আশাবরী কিংবা মেঘমল্লার । কেবল কন্ঠের বদলে এই উচ্চাঙ্গের কথাকলি ওদের আঁখিপল্লবে । হৃদয়ে বৃষ্টি ঝরায় ,

অসময়ে । মৃত্যুর পোশাক পরে ওরা ঘোরে , পুষ্পবনে-
--কুঁড়ি ফোটার মধুঋতুতে , ভ্রমরের গুঞ্জনে ।

যেহেতু চন্দন সিং এখন প্রেত তাই উনি সর্বত্র স্পিডে যান । আর ওর কোনো পারমিট লাগেনা , কোথাও যেতে । হয়ত সেজন্য উনি ঘুরে এলেন একাই, সতীপুরের নদী কিনারা থেকে । পবিত্র কাবেরী নদী এখানে । কচি কচি শিশুদের রুটিরুজি অপরের অর্ধ পোড়া দেহাংশ আর চিতার ধূলিকণা ।

কুমুদ আর বিজলীও গিয়েছিলো । আলাদা আলাদাভাবে । চন্দন সিংয়ের এই লো-প্রোফাইল বিয়ের কথা কেউ জানেনা । বিজলীর সারমেয় স্বামী ওর পরম বিশ্বাস ভাজন ছিলো । সততার পরাকাষ্ঠা । আর চন্দন সিং রাঠোর প্রেতলোক থেকে ওকে রক্ষা করার ভার নিয়েছেন । আজ ওদের হোটেলে বিজলী বিশেষ আদৃতা । মালিকের পত্নী হিসেবে । কুমুদের লোকপ্রিয় কাফে এদের হোটেলের সাথে সম্পর্ক পাতিয়েছে । কুমুদ মানুষ ভালো আর ভালো শেফ্ । কাজে কাজেই ।

Dame Daphne du Maurie এর Rebecca--র

মতন ঘটনা । বিজলী ; চন্দন সিং এর মৃতা প্রিয়া সুহানার ছায়া দেখতে পায় ঐ হোটেলে । আর কেউ দেখেনা ওকে বা দেখেও-নি । কোনোদিনই ।

ওকে যেন ফলো করে সুহানা । ভালোমন্দ জানতে চায় । আর প্রেতের স্ত্রী বিজলী অন্য এক প্রেতিনীকে ভীষণ ভয় পায় । কেঁপে কেঁপে ওঠে ওর সর্বসত্ত্বা । **যেন সুহানার গদিতে ও বসে পড়েছে ।**

ওর এলাকায় প্রবেশ করে, ওরই প্রেমাস্পদকে কেড়ে নিয়েছে । হয়ত ওর প্ল্যান ছিলো পরজন্মে চন্দন সিং এর বাহুবন্ধনে ডুবে যাবে । কিন্তু **মাছরাঙা রাঠোর** এখন পার্থিব এক মৎস্যকন্যার প্রেমে পাগল । তার চেতনা অবলুপ্ত হয়েছে , অজান্তেই ।

সেইকারণে হয়ত সুহানা ঈর্ষান্বিতা । কে জানে ?

অশরীরি সংবাদ **কজনই বা পায় আর মানে ?**

মনে প্রশ্ন জাগে বিজলীর :: এই চন্দন সিং কে ?

সুহানার পরিচয় কী ? কেন এই হোটেল ; এক প্রেতের হুকুম মেনে চলে এই ২০১৬ সনে ? কেন ?

ভীষণ ভাবছে কদিন ধরেই ।

কুমুদের সাথে সাক্ষাৎ হলে তাকেও বলেছে। কুমুদ তো ভারি খুশি । চন্দন সিংয়ের ব্যাটেলিয়ান গিয়ে সতীপুরের শিশুকূলকে রক্ষা করেছে ঐ পাশবিক সংস্থাগুলির হাত থেকে । ওখানে এখন থেকে মেশিন দিয়ে মাটি সাফ হবে । মেশিনই আলাদা করে ফেলবে মাটি আর হাড়-মাংস । বাচ্চাগুলি এখন স্কুলে ভর্তি হচ্ছে এক এক করে । ওরা ফ্রিতে পড়ে । চন্দন সিং রাঠোরের কৃপায় ওদেরই সংস্থা খুলেছে স্কুল, সতীপুরে । তবে সেখানে বিদ্যালাভের পরে ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই স্কুলের ক্লাসরুম, বাথরুম, বারান্দা সব ক্লিন করে দিয়ে আসে । এটা ওরা স্বেচ্ছায় করে ।

আর ওরা ক্ষেতে সবজি চাষ করে । ছোট ছোট গাছ লাগিয়ে সবজি ফলায় । তারপর হোটেলের কিচেনে বিক্রি করে । মজার ব্যাপার । কচি হাতের অর্গ্যানিক ফসল আর কি ! হোটেলে এগুলি **ক্লিন গ্রীন** নামে বিকায় ।

কুমুদ বলে :: কার ভাগ্যে কী শিকে ছেড়ে কে জানে !

মড়ার মাংস খুবলে খেতো দুদিন আগে আর আজ দেখো, কত বড় বড় মানুষ এদের হাতে তৈরি সবজি খেয়ে বাহবা দিচ্ছেন । ওহে জামাই বাবাজী যুগ যুগ

জিও-- জিও চন্দন সিং রাঠোর , ভূত হয়েই ! বলেই ফিক্ করে হেসে ফেলে ।

তারপর বিজলীর প্রশ্নের উত্তরে বলে ওঠে :: তোদের পড়ুয়াদের এই এক সমস্যা । সবকিছুর হিসেব মেলা চাই । নাহলে ঘুম হয়না । আরে যে যত জানে তার অশান্তি তত বেশি । শেষকালে পন্ডিতেরা বদ্ধ পাগল হয় , জানিস্ না ? তুই চন্দনের স্পর্শ লুটেপুটে নে । চন্দন গাছের খবর জেনে কী হবে ?

মনে পড়ে বিজলীর যে বোদ্ধাদের ব্যাপারে কোনো এক বিখ্যাত ব্যাক্তি বলেছেন :: :: They Suffer Paralysis By Analysis---

বিজলী তো অনেক বই পড়েছে ও পড়ে । ওর নতুনের চেয়ে পুরাতন বইয়ের গন্ধ ভালোলাগে । কারণ ও লাইব্রেরিতে পুরনো বই পড়তো । বাজারে একধরণের পারফিউম এসেছে যাকে লোকে পুস্তকবাস বলে । সেই সেন্টের সুবাস পুরনো বইয়ের মতন । বিজলী ওগুলি কিনে আনে আর ঘরে ছড়িয়ে দেয় । ভালোলাগে বইপাগল মেয়ের এই মন উজাড় করা গন্ধ । অবসেশানের চেয়ে প্যাশন ভালো । তবুও বই ওর

অবসেশান হয়ে গেছে । সবকিছুতে লজিক খোঁজে । অনুসন্ধান করে । তাতে জীবনের রং চটে যায় কোথাও কোথাও । তবুও মন মানেনা । কিছুটা হয়ত **বিবলিওমেনিয়াক** -ও । একই বইয়ের বহু কপি কিনে রাখে পাছে হারিয়ে যায় জ্ঞানভান্ডার !

মূর্খ কুমুদ বলে :: বই তো পাতা দিয়ে তৈরি । আসল জ্ঞান তো তোর মনে মনে থাকবে ! বই আঁকড়ে কী হবে ?

বিজলীও ভাবে, সত্যি তো প্রথম বইটা যে লিখেছিলো তার জ্ঞান এলো কোথা থেকে ? নিশ্চয়ই মনে মনে । শুনে শুনে । কাজ করে ও ফল পেয়ে পেয়ে ।

দেওয়ালে ওর স্বামীর বিশাল পেন্টিং । কিন্তু উনি সর্বত্র বিরাজমান । আর ছায়ামানুষ হয়ে আছে সুহানা । তার কষ্ট ফুটে ওঠে মাঝে মাঝে আর্শিতে । রক্তকণিকা হয়ে । কিন্তু আর কেউ সেগুলি দেখতে পায়না ।

আর চন্দন সিংয়ের ছায়াশরীরের পরশ পায় বিজলী ।

মধুরাতে । তখন ওর নিজে থেকে অর্গাজম হয় । যাকে চিকিৎসা শাস্ত্রে বলে spontaneous orgasm--- আর **Fusion tantra বলে ::**

Tantric Masturbation, Orgasm with Spirit.

বিজলীর মনে হয় যে চন্দন সিং রাঠোর আসলে একটি মহাকাশের পোর্টফোলিও । যেখানে আবেগ , প্রেম, দয়া , কর্তব্য এসবের সাথে সাথে আছে চেতনার স্বত:স্ফূর্ত বিচ্ছুরণ । তাই বুঝি উনি মরে গিয়েও জীবিত । ওকে কেউ আসলে দেখেনা । অনুভবও করেনা । যখন মনে হয় উনি অনুমতি দিচ্ছেন সেটা আসলে **সময়ের ঘোড়ায় চড়ে** পেছনে ফিরে যাওয়া । বার বার অতীতকে ওরা রিপিট করে । ওরা ভাবে চন্দন সিং রাঠোর এখন অস্থিমজ্জায় থাকলে কী বলতেন ? কী ভাবতেন আর কী করতেন ? সেইভাবেই ওরা মানসিক প্রস্তুতি নেয় আর কাজ করে চলে । হয়ত এই মানসিক দ্যুতি থেকেই চোখ ধাঁধিয়ে যায় তাই ক্যামেরা বন্দী ছবি চোখের আড়ালেই রয়ে যায় । আর লোকে মনে করে যে উনি না চাইলে ছবি ওঠেনা ।

উনি আলোর স্ফুলিঙ্গ নিয়ে খেলতে জানেন ।

তাই বুঝি রেবেকার মতন সুহানার ছায়াও ধাওয়া করে বিজলীকে । আসলে বিজলীর মনকে । অবচেতনে ।

আসলে সুহানা অথবা চন্দন সিং নয় বিজলীর আনন্দে বাধা দিচ্ছে তারই অবচেতন মন ।

লজিক/ যুক্তি এবং চিন্তার জাল থেকে বেরিয়ে বিজলী বুঝতে পারে বা অনুভব করতে পারে যে প্রয়াত চন্দন সিং রাঠোর এক **কালেকটিভ কনশাসনেস্** ।

সমাজে যার নানান অংশ বিচ্ছুরিত হয়ে চলেছে অজান্তেই । কখনও সুহানার ছায়া হয়ে , কখনও হোটেলের পরিচালক হয়ে আবার কোনো কোনো সময়ই নিছকই কারো স্বামী হয়ে । এই বিযুক্ত প্রেত আত্মা আসলে লুকিয়ে আছে বিজলী ও অন্যান্য মানুষের চেতনার কণা হয়ে কোনো গভীর , গোপন মন গহ্বরে । যার প্রতিটি টুকরোকে জুড়ে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন সময় রূপ দিয়ে চলেছে নানান কাহিনীর ও সত্ত্বার ।

এইজন্যেই মনে হয় বলা হয় যে মহাকালের স্রষ্টা আমরাই । সময় ও কাল তৈরি হয়েছে বিভিন্ন কাহিনী দিয়ে । যা অনিন্দ্য সুন্দর ও কালজয়ী । যা শিক্ষণীয় ও স্পর্শকাতর । তাই বুঝি বিজলীর অদেখা , রেখাহীন , সীমাহীন , তড়িৎ গতিতে চলা পতিদেব , চন্দন সিং রাঠোর এক কালপুরুষ ।

শুধু আজ গান্ডীবের বদলে তার হাতে অজস্র প্রেম ও ক্ষমার মশাল ।

"We were the people who were not in the papers. We lived in the blank white spaces at the edges of print. It gave us more freedom.
We lived in the gaps between the stories."
– **Margaret Atwood**, **The Handmaid's Tale**

The End